পাহাড়ে আম উৎপাদনে নীরব বিপ্লব

মোঃ বেলায়েত হোসেন

পাহাড়েও আম চাষ হচ্ছে। বিষয়টি কারো কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। ভৌগোলিক সীমারেখায় বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাহাড়ি অঞ্চল। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই আছে দেশের মোট ভূমির প্রায় ১০ শতাংশ। এ ভূমি অনেকাংশ জুড়ে বনাঞ্চল। কিছু অংশ আবাদি এবং কিছু অংশ অনাবাদি। বনের পাশাপাশি রয়েছে কৃষি বা চাষাবাদের অপূর্ব সুযোগ। ভূমি বৈচিত্র্যের জন্য মাঠ ফসলের চেয়ে উদ্যান ফসল চাষের জন্য পাহাড় বেশি উপযোগী বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আমবাগান এমন একটি উদ্যানের প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণতা দিয়েছে অনেকটা। বর্তমানে পাহাড়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত ফলের মধ্যে আম উল্লেখযোগ্য। আম্রপালি, কাটিমন, কিংসাপা, রাংগোয়াই, বারী-৩, বারী-৪, হাড়িভাঙ্গা, কিউজা, বুনাইকিংসহ প্রায় ৪২ প্রজাতির আম চাষ হচ্ছে। বিদেশি জাতের মধ্যে জাপানের সূর্যডিম, মিয়াজাকি, থাইল্যান্ডের ব্যানানা ম্যাংগো, যুক্তরাষ্ট্রের রেডপালমার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। এখানে দেশীয় আমের চেয়ে বিশেষ জাতের বা উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাতের আমের খুব কদর রয়েছে। চাহিদা অনুসারে চাষাবাদও শুরু হয়েছে। মাটির উর্বরতা অনুযায়ী নতুন বিদেশি জাতের আম চাষে সফলতাও লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে দেশি-বিদেশি উন্নত জাতের আম চাষে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৮৯ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এর মধ্যে প্রায় ৭৮ শতাংশের অবস্থান চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে। অধিকাংশই জুম চাষ অথবা সীমিত আকারে ফল চাষ করে নিজেদের খাদ্য যোগায়। কাজেই তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদিকে যেমন খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তেমনি তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দরকার আয় বৃদ্ধি করা। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির সহজ উপায়ের মধ্যে পাহাড়ে আমের বিদ্যমান বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারণ, উৎপাদিত আমের উপর ভিত্তি করে প্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজন, আম হতে উৎপাদিত পণ্য দেশ-বিদেশের বাজারে বিক্রির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ অন্যতম।

পাহাড়ে অনেক অনাবাদি বা পতিত জমি আছে। সেসব জমিতে সমতলের মতো ধান, গম, আলু করা যায় না। অথচ উদ্যোগ নিয়ে সহজে আম চাষ করা যায়। পাহাড়ে আমগাছের বিশেষত্ব হচ্ছে দুর্যোগজনিত ঝুঁকি কম। পাহাড়ের মাটি ও আবহাওয়া নানা জাতের আম চাষের উপযোগী। অন্য ফসলের তুলনায় অধিক লাভজনকও। আম পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অন্যতম উৎস। পাহাড়ে আম চাষের ফলে সেখানকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। এদের অনেকে চাকরি ছেড়ে আম বাগান করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তৃণমূল পর্যায়ে খবর নিয়ে জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া উচ্চ শিক্ষিত পাহাড়ি ছেলে মেয়েরা চাকরির পিছনে না ঘুরে নিজেরা উদ্যোক্তা হয়েছেন। নিজেদের করা আম বাগানে চাকরি করছে অনেক শ্রমিক। বেকারত্বের বোঝা কিছুটা হলেও লাগব হচ্ছে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও বিমান বন্দর কাছাকাছি থাকায় বিদেশে ফল রপ্তানির ভালো সুযোগ রয়েছে। হচ্ছেও তা। এছাড়া সড়ক পথে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এতে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন মানের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে পার্বত্য অঞ্চলের আম চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বিগত দুই দশকে এ অঞ্চলে আম চাষে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। ১৯৯৮-৯৯ কালিকাপুর মডেল প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ে আম্রপালির আবাদ শুরু হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সরকার ৪০০০ পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরণ এবং পরিচর্যার জন্য বাগানীদের আর্থিক সহযোগিতা করেন। সেই থেকে পথচলা। সরকারের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতায় এবং ব্যক্তি উদ্যোগে বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় মোট বাগানির সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি। মোট উৎপাদিত আমের ১৫ শতাংশ এ তিন জেলায় উৎপাদন হয়ে থাকে। তিন পার্বত্য জেলার কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের সূত্র মতে, আয়বর্ধক হওয়ায় আম চাষে কৃষকের আগ্রহ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাষের জন্য বাগানের সংখ্যার সাথে চাষির সংখ্যাও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বান্দরবান জেলায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০ হাজার ২ শত ৩৯ হেক্টর জমিতে ১ লাখ ১২ হাজার ২৮৫ টন আম উৎপাদন হয়েছে। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ১লাখ ১৩ হাজার ৩০০ টন। রাঙ্গামাটিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ হাজার ৭০০ হেক্টরেরও বেশি জায়গায় আমের বাগান করা হয়েছে। খাগড়াছড়িতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪ হাজার ৪ শত ২১ হেক্টর জমিতে আমের বাগান করা হয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা বেড়ে ৮ হাজার হেক্টরেরও বেশি জায়গায় আমের বাগান করা হয়েছে। যেখানে আমচাষীর সংখ্যা ৩ হাজার ৫ শতেরও বেশি। বাগানের সংখ্যা ছোট বড় মিলে প্রায় ১০ হাজার। উৎপাদিত আমের মধ্যে রাংগোয়াই ৭০ শতাংশ, আম্রপালি ১০ শতাংশ, হাড়িয়াভাঙ্গা, মল্লিকা, মিয়াজাকিসহ অন্যান্য জাতের ২০ শতাংশ। পাহাড়ে উৎপাদিত আমের চাহিদা দিনে দিনে দেশে- বিদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশার আলো উঁকি দিচ্ছে পাহাড়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে। বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে পাহাড়ের আম। কৃষি বিভাগের মতে, আম্রপালি ১০ জুন, রাংগুয়াই ১০ জুলাই, বারি-৪ জুনের শেষে, আশ্বিনা জুনের শেষে এবং ব্যানানা ম্যাংগো ১৫

জুনের পর ছেঁড়ার নির্ধারিত সময়। কারণ নির্ধারিত সময়ের আগে আম ছিঁড়লে তা অপরিপক্ব থেকে যায়। বাজারমূল্য যথাযথ পাওয়া যায় না। পুষ্টিগুণেও থাকে অপূর্ণতা।

বন উজাড়ে যখন জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস নিয়ে চারদিকে হতাশা আর হৈচৈ; তখন পাহাড়ে আম বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাখিসহ অন্যান্য জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমাদের আশা সঞ্চার করছে। এছাড়া এতে অনেক জাতের আমের জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। হাইব্রিড জাতের আম চাষ পাহাড়ি জনপদের মানুষের জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম। সরকার ইতোমধ্যে পাহাড়ে বিশেষ করে তিনটি পার্বত্য জেলায় আম আবাদ সম্প্রসারণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে কারণে বিগত দশকে পাহাড়ে আমের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। এক অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। আম্রপালি জাতের আম চাষে পাহাড়ে বিপ্লব ঘটেছে। পাহাড়ি অঞ্চলে আমের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির চমৎকার সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আরও কিছু বাস্তবমুখী বিষয় বিবেচনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে আম চাষ নিয়ে গবেষণা জোরদার পূর্বক এ অঞ্চলের উপযোগী বিভিন্ন উন্নত জাতের আমের উদ্ভাবন করা সময় সাপেক্ষ। ফ্রুট জোনিং করতে পারলে যে জাতের আম যেখানে ভালো হয় সেখানে বেশ কিছুটা এলাকাজুড়ে শুধু সে জাতের আমের বাণিজ্যিক চাষাঞ্চল গড়ে তোলা যায়। এতে বাজারজাত করা যেমন সুবিধা হয়, তেমনি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা যায়।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শুধু গাছ নয়, জাত নির্বাচনেও গুরুত্ব দেওয়া খুবই জরুরি। যেমন আগাম জাত বারি আম ৫ ও বারি আম ৪ জাতের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে আম প্রাপ্তির সময়কালকে দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে। সরকারিভাবে হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের মাধ্যমে ও বেসরকারি নার্সারি দ্বারা উক্ত চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চাষিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। পাহাড়ে লাগানো গাছসমূহের আধুনিক নিয়মে ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিচ্ছেন অনেকে। রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এছাড়া, আমে ফ্রুট ব্যাগিং করা যেতে পারে বলে মনে করেন কৃষিবিদগণ। অসময়ে বা বারোমাসি ফলানো আমের দাম বেশি পাওয়া যায়। গবেষণায় সে দিকেও নজর দেওয়া উচিত।

আম প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের সব জায়গায় বিক্রির ব্যবস্থা বা নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু সারাবছর কাঁচামাল পাওয়া যায় না। তাই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ওপর গুরুত্বারোপ জরুরি। এতে শিল্প সচল রেখে কারখানার শ্রমিকদের পুরো বছর কাজ করার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। পাহাড়ের দুর্গম এলাকা থেকে বাজারে ফল আনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ, সংগৃহীত ফলসমূহ বিক্রির পূর্ব পর্যন্ত তার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানো, সংরক্ষণ বা মজুদের যথাযথ সুবিধা গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিবেচনা এ খাতকে আরও নিশ্চিত সমৃদ্ধ করবে। পাহাড়ে আম গাছে সেচ দেওয়া এক অন্যতম প্রধান সমস্যা। পাহাড়ে যে বছর এপ্রিলে কম বৃষ্টি হয় বা হয় না সে বছর আম ঝরা বেড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষীরা। ক্রমাগতভাবে পাহাড়ি বন উজাড়ের ফলে বৃষ্টি কম হয় ও পাহাড়ের ঝিরিসমূহে পানির সঞ্চয় থাকে না। ফলে ঝিরি বা পাহাড়ের খাদে জমা জলাশয়ের পানি থেকে পাম্প করে ফলগাছে সেচ দেয়া যায় না। এক্ষেত্রে অল্প পানি থাকলেও ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে যথাসময়ে ফল গাছের গোড়ায় সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা পাহাড়ে আম আবাদের বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

#

লেখক : তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, খাগড়াছড়ি

পিআইডি ফিচার